হাসান ফেরদৌস

বেদনার কী রং

নিউজার্সির ইউনিয়ন টাউনশিপ, না শহর-না গ্রাম। নিউইয়র্ক শহর থেকে মাইল বিশেষ দূরে হবে। ঠিক তার বুকের ওপর কয়েক শ' একর জায়গা নিয়ে কেন্ ইউনিভার্সিটি। ১১ হাজার ছাত্রের ক্যাম্পাস, তাদের অধিকাংশই এ অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ট্রেনে, বাসে ও গাড়িতে করে পড়তে আসে। সে জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় 'কমিউটার ক্যাম্পাস' হিসেবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই শ্বেতকায়। অল্প কিছু দক্ষিণ এশীয় রয়েছে, তাদের মধ্যে জনা কয়েক বাঙালিও।

৯ ডিসেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাথান ওয়াইজ গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের আমন্ত্রণে আমরা শ'খানেক বাঙালি জড়ো হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটন থিয়েটারে। সঙ্গে আরও পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর জন আমেরিকান। ঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা দেরি করে এসেছে, তারা রইল শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ মাটিতে বসে। অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলোকস্ট ও জেনোসাইড স্টাডিজের প্রধান সমন্বয়কারী এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক প্রফেসর বার্নাড ওয়াইনস্টিন সবাইকে অনুরোধ করলেন, 'আসুন, আমরা এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ বাঙালির স্মরণে নীরবতা পালন করি।'

মাত্র এক মুহূর্তের নীরবতা; কিন্তু সে মুহূর্তটি আপনাদের কাছে বর্ণনা করি -- সে ভাষাজ্ঞান আমার নেই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের প্রায় অজ্ঞাত, নিভৃত এক শহরে দাঁড়িয়ে আমরা কেন একাত্তরের শহীদদের কথা স্মরণ করছি? এরা কারা আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাঙালি শহীদদের কথা ভেবে উঠে দাঁড়িয়েছে? আমার পাশে দাঁড়িয়ে যে প্রৌঢ় ইহুদি দম্পতি, তাঁরা এই আমন্ত্রণ পাওয়ার আগে বাংলাদেশ নামের এই দেশটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কেবল এর নামের সঙ্গে। ঠিক কোথায় সে দেশ, সে সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা তাঁদের নেই। তিন তরুণী, তাঁদের একজন কৃষ্ণকায়, জানালেন, বাংলাদেশ নামের এ দেশটির কথা তাঁরা জেনেছেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামের একটি অ্যালবাম থেকে। ব্যস, আর কিছু তাঁরা জানেন না। অধ্যাপক ওয়াইনস্টিনও স্বীকার করলেন, প্রায় অপরিচিত এই দেশে ৩৬ বছর আগে এক অভাবনীয় গণহত্যা ঘটে গেছে, এ কথা তিনি পর্যন্ত ভালোভাবে জানতেন না।

তাহলে, রোববার, শীতকাতর এমন এক বিকেলে, কেন তাঁরা এখানে জড়ো হয়েছেন?

বিশ্ববিদালয়ের সভাপতি, দাউদ ফারাহি, সে কথা ব্যাখ্যা করে বললেন। তিনি নিজে আফগান, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের নাগরিক। ১৯৭২ সালে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একবার গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির অবস্থা নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয় তাঁর। তিনি বললেন, '৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে জাতিগত বৈষম্যের কারণে। বিশ শতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, এমন ভয়াবহ মানবেতর ঘটনা আর ঘটেনি। এ কেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে আমরা সে ঘটনা মনে রাখব না, অথবা সে ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা নেব না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত নির্মম হলোকস্টের পর কি আমরা বলিনি, 'আর নয়, আর কখনোই এমন গণহত্যা নয়?'

পৃথিবীর এই বিস্মৃতি, তা আসলে এক গভীর নৈতিক অপরাধ। আমাদের মানবিকতা প্রকাশিত হয় অন্যের প্রতি আমাদের সহমর্মিতায়। ধর্ম নয়, জাতি নয় বা ভাষা নয়; আমরা এক অন্যের সঙ্গে অন্তর্গতভাবে সম্পৃক্ত শুধু আমাদের 'মানুষ' পরিচয়ে। এই সম্পৃক্ততার জন্যই আমরা এক অন্যের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা নাৎসি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করি, গৃহহীন ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মিছিলে নামি, ইরাকি শিশুহত্যার প্রতিবাদ করি। এই মানবিকতাই ১৯৭১ সালে ফিলাডেলফিয়ার অতি সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের প্রেরণা জুগিয়েছিল জীবন বাজি রেখে অতিকায় অস্ত্রবাহী পাকিস্তানি জাহাজ শুধু ডিঙি নৌকা দিয়ে ঠেকিয়ে দিতে।

ড. ফারাহি এবং অধ্যাপক ওয়াইনস্টিন জানালেন, একাত্তরের গণহত্যার ঘটনা যাতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়, সে জন্য তাঁরা একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে একটি মাস্টার্স কোর্স চালু করতে যাচ্ছেন তাঁরা। এখনো উদ্যোগটি প্রস্তাব আকারে রয়েছে। এক বছরের মধ্যে পাঠ্যসূচী তৈরি করা হবে, শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, কর্মসূচিটি চালু রাখার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হবে। 'আমাদের চেষ্টার কমতি হবে না', তাঁরা দুজনেই জানালেন।

এ উদ্যোগের পেছনে আসল চেষ্টা প্রবাসী বাঙালিদের। তাদের হয়ে এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন ড. নুরুন নবী। তিনি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। যখন যেভাবে সম্ভব, সবাইকে একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দেওয়াকে তিনি যেন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যখনই সুযোগ পান, একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অপরাধের কথা

তুলে ধরেন। তাঁরই চেষ্টায় এ অনুষ্ঠানে একাত্তরের গণহত্যায় যারা নিকটজনদের হারিয়েছেন, এমন ১৫টি পরিবারের সদস্য সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ অনুষ্ঠানে স্বজন হারানোর স্মৃতিচারণা করলেন। কেউ হারিয়েছেন বাবা, কেউ হারিয়েছেন ভাই, কেউ বা হারিয়েছেন চাচাকে। হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে উষ্ণ স্থানে সযত্নে তুলে রেখেছিলেন যে স্মৃতি; খুব কাছের নয়, এমন কাউকেও যে কথা তাঁরা সহসা বলেন না; সম্পূর্ণ অপরিচিত – এমনকি ভিন্ন ভাষাভাষী একদল মানুষের কাছে সে ঘটনাই তাঁরা বর্ণনা করলেন। বুক ভেঙে আসে বেদনায়, চোখ ভেসে যায় জলে, ব্যথায় ও ক্রোধে বাক রুদ্ধ হয়ে আসে। তবু তাঁরা স্মৃতি হাতড়ে মনে করলেন সেই ঘটনা। যেন মুহূর্তেই আমরা সবাই এক অজ্ঞাত আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। ঘুচে যায় ভাষার ব্যবধান, জাতিগত ব্যবধান, ধর্মের ব্যবধান। স্মৃতি হয়ে ওঠে আমাদের সবার অভিন্ন মানবিকতা প্রকাশের মাধ্যম।

ড. বার্নাড ওয়াইনস্টিন এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে বললেন – 'দেখুন, আমি নিজে ইহুদি। আমরা বলি, মনে করার ভেতর দিয়ে আসে প্রায়শ্চিত্ত--রিডেম্পশন কামস থ্রু রিমেমব্র্যান্স।' তাঁর সে কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, একাত্তরের প্রায়শ্চিত্ত করবে কে? এ কি কেবল পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন এই সব শহীদ পরিবারের সদস্যদের একার দায়িত্ব? আর কী-ই বা হবে সে স্মৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি কোনো শিক্ষাই না পাই তা থেকে? বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সাড়ে তিন দশক অতিক্রম করেছে। সময় যত বয়ে গেছে, তত ধুলো জমেছে আমাদের সম্মিলিত চেতনায়। কী আশ্চর্য অবজ্ঞায় আমরা একাত্তরের শহীদদের স্মৃতি মাদুরের নিচে ঠেলে দিয়েছি! কী অবাক প্রতারনায় আমরাই সেই একাত্তরের ঘাতকদের জাতীয় নেতার সম্মান দিয়েছি! এমন স্মৃতিভ্রষ্ট ও মানবিকতাহীন জাতি পৃথিবীতে আর কয়টি আছে?

আমি এই লিটল থিয়েটারের আশপাশে তাকাই। চেনা-অচেনা মানুষগুলোর চোখে জল; কিন্তু সে চোখে এক অস্পষ্ট প্রতিজ্ঞাও ঝিলিক দেয়। সে চোখে আমি এই প্রতিজ্ঞা দেখি – বাংলাদেশ তার ৩০ লাখ শহীদকে যদি ভুলেও যায়, আমরা ভুলব না।